২৯।১০।৮৫

# নিরক্ষরতা মোচন অভিযানের নানাদিক

131

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান জানিয়েছেন, ১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সারাদেশে কর্মরত দেড় লাখ গণশিক্ষা কর্মীর কাছে নয় লাখ প্রাথমিক শিক্ষার বই সরবরাহ করা হয়েছে। তিন লাখ নব্বই হাজার শিক্ষক পঞ্চাশ লাখ শিক্ষার্থীকে অক্ষরজ্ঞান দিচ্ছেন। গণশিক্ষা দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যারা আগামী এসএসসি, কামেল, ফাজেল ও আলেম পরীক্ষা দেবেন, গণশিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের ৫০ নম্বর দেয়া হবে। গণশিক্ষা বিস্তারে সরকার যে সত্যই আগ্রহী ও উদ্যোগী এবং শিক্ষা-বিপ্লব যে মোটেই কোন স্টান্ট নয়, বরং সমাজ থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার আন্তরিক প্রয়াস—এসব কার্যক্রম তারই প্রমাণবাহী। এই কর্মসূচীগুলি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজ যে অনেক দূর এগিয়ে যাবে, একথা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিরক্ষরতা জগদ্দল পাথরের বেড়ীর মত সমাজকে সব সময় পেছনে টেনে রাখছে। শিক্ষার অভাবে জনসাধারণ না পারছে নিজেদের ভাগ্য বদলাতে, না পারছে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা সবখানেই একটা বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে। শিক্ষাবঞ্চিতরা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করতে পারছে না, তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না নতুন যুগের সঙ্গে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টাও তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তার ফলে স্বাধীনতার আসল উদ্দেশ্য অর্জন অর্থাৎ জনগণের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের সুব্যবস্থা, জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি এবং বিশ্ব দরবারে জাতিকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে আসীন করার উদ্দেশ্যেই এদেশের মানুষ সীমাহীন আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই স্বপ্ন রূপায়ণের উদ্দেশ্যে দেশে চলছে উন্নয়নের শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। খাদ্যশস্যের ফলন দ্বিগুণ করা, কুটির ও বড় শিল্পের সম্প্রসারণ, সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানো, পরিকল্পিত জনসংখ্যা গড়ন ইত্যাদি এই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য। এই বিপ্লবের সফল বাস্তবায়ন সমাজের সকল মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। জনসাধারণকে একথা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে উন্নয়ন বিপ্লব তাদেরই কল্যাণার্থে এবং এর পুরো সুফল তারাই ভোগ করবে। এই সত্য অনুধাবন এবং সমাজ বিবর্তন উদ্যোগে অংশী হওয়ার জনগণের মানসিক প্রস্তুতির জন্য দরকার শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার। কারণ, ক্ষেত্র প্রস্তুত [illegible] তৈরি না হলে কোন শুভ প্রচেষ্টাই যেমন সফল হয় না, তেমনি [illegible] না হলে কোন নতুন [illegible] গ্রহণে [illegible] [illegible] রকমের পরিবর্তন আনাও সম্ভব হয় না। প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারই সমাজমানস পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি।

এই সত্যোপলব্ধি থেকেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষা বিস্তারকে উন্নয়ন বিপ্লবের অঙ্গীভূত করেছেন। বলা বাহুল্য, নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচনের কথা অতীতেও অনেক বলা হয়েছে, শিক্ষার আলো ছড়াবার নামে অনেক টাকা-পয়সাও খরচ হয়েছে। কিন্তু হিসাব খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে শিক্ষিতের হার তেমন একটা বাড়েনি। প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত বলতে যারা কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে নাম দস্তখত করতে পারে তাদের বোঝায়। পরিতাপের ব্যাপার, এমন লোকদের নিয়েও শিক্ষিতের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার একুশ-বাইশ শতাংশের বেশি নয়। দেশ ব্যাঙের ছাতার মত স্কুল-কলেজ গজিয়েছে, কিন্তু শিক্ষিতের হার বাড়েনি তেমন। গত বছর নিরক্ষরতা মোচন দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপ্লবরূপে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এ ব্যাপারে সমাজে একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন তৎপর হয়ে উঠেছে, তেমনি জনগণও অক্ষরজ্ঞান লাভের আগ্রহ প্রকাশ করছে। নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচনের কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে সর্বশক্তি। কেবল বিপুল অর্থ বরাদ্দই নয়, বিভিন্ন পরিকল্পনা মোতাবেক কাজও এগিয়ে চলছে।

জনশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ করতে হলে আমাদের জাতির জন্য কোন শিক্ষা দরকার এবং কীভাবে তা জনগণের কাছে সুলভ করা যায়—সেটা ঠিক করতে হবে সবার আগে। মনে রাখতে হবে যে লিখতে-পড়তে পারাটাই সত্যিকার শিক্ষা নয়। সার্থক জনশিক্ষা সেটাই যা ব্যক্তির ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনের উন্নতিতে সমানভাবে সহায়ক হয়। যে শিক্ষা আমাদের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটায়, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা যোগায়, চরিত্র গঠন করে, সামাজিক কর্তব্যবোধ জাগায়, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ উদ্বোধন করে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং স্বাস্থ্যবিধি ও রাজনীতি-সমাজনীতির সাধারণ জ্ঞান শেখায়, সেই শিক্ষাই দরকার আমাদের জন্যে। কৃষি উন্নয়ন, কুটির-শিল্পের উৎপাদন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ ইত্যাদিতে সহায়ক হতে হবে শিক্ষাকে। এছাড়া, আমরা যেহেতু গণতন্ত্রপ্রিয়, সেহেতু গণতন্ত্রমুখী ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই [illegible] জনশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে [illegible] এ কারণে শিক্ষার সুযোগ [illegible] হবে ছাড়িয়ে [illegible] হবে ছোট-বড়, ধনী-গরীব সবার মধ্যে। শিক্ষাটা হতে হবে সবার জন্য এক ও অভিন্ন।

প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্কুল-কলেজের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা যে তেমন সফল হচ্ছে না, একথা সবার জানা। এ কারণেই সম্ভবত 'গণশিক্ষা স্কোয়াড' পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী, পল্লী প্রতিরক্ষা বাহিনী, মসজিদের ইমাম—সবাইকে একাজে লাগানো হচ্ছে। এই ব্যবস্থার সীমিত কার্যকারিতা স্বীকার করে নিয়েও বলব : জনশিক্ষা বিস্তারের আরও সহজ ও ফলপ্রসূ উপায় আছে এবং সেই উপায়গুলি দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিশু এবং বয়স্ক উভয়কেই লেখাপড়া শেখাতে হবে। আমাদের শিক্ষাবঞ্চিত জনগণের গরিষ্ঠ অংশ হল গ্রামবাসী কৃষক, বিভিন্ন পেশাজীবী ও দিনমজুর। তারা সাধারণত ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ শিক্ষা গ্রহণে তেমন আগ্রহী নয়। কারণ, তাতে তাদের রুজি-রোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং এমনভাবে তাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে যাতে তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মও ঠিকভাবে চলে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের কাজও হয়ে যায়।

আমাদের শিক্ষিতের হার কম হওয়ার বড় কারণ, দেশে স্কুল-বয়সের যত শিশু আছে, তাদের বড় অংশটাই স্কুলে ভর্তি হয় না; যারা ভর্তি হয়, তাদেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাথমিক পর্যায়েই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। দেশে বর্তমানে স্কুল বয়েসী শিশু আছে আনুমানিক দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ, কিন্তু স্কুলে যাচ্ছে মাত্র আশি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজারের মত। সব শিশু যদি স্কুলে যাওয়ার এবং প্রাথমিক পর্যায়টা শেষ করার সুযোগ পেত, তাহলে শিক্ষিতের সংখ্যা যে অনেক বেশি হত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং সব [illegible] শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার এবং যারা ভর্তি হচ্ছে অন্ততপক্ষে তাদের স্কুলের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

দেশে বয়স্ক নিরক্ষর পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াবার জন্য যাত্রা, কথকতা, বাউল গান, পটুয়া গান ইত্যাদি লোকনাট্য ও লোকসঙ্গীতকে কাজে লাগানো হলে সুফল পাওয়া যাবে। আমাদের জনগণ ঐতিহ্যগতভাবে এ সবের দারুণ ভক্ত। তাদের কাছে এগুলির এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। অক্ষরজ্ঞান, পরিবার [illegible] পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যবিধি, কৃষি [illegible] বিদ্যা, কুটির শিল্পের উৎপাদন [illegible] ইত্যাদি বিষয় লোকগীতি লোক-নাট্য ও গল্পগাথার মাধ্যমে সহজে গ্রামীণ মানুষকে শেখানো যায়। গ্রাম-গঞ্জের নানারকম লোক-শিল্পও শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে সহায়ক হতে পারে। আমাদের অসংখ্য মানুষ কাঠের কাজ, বেত-বাঁশের কাজ, গিল্টের কাজ, কাপড় ছাপা, তাঁতশিল্প, রেশম শিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি কারুশিল্পে নিয়োজিত। এসব লোকশিল্পের মাধ্যমে অক্ষর ও সংখ্যা পড়ানো ও লেখা শেখানো সম্ভব। নকশিকাঁথা সেলাই-এর সময় মেয়েরা একই ভাবে অক্ষর ও সংখ্যা পরিচয় লাভ করতে পারবে। লোকশিল্পগুলি তাদের দৈনন্দিন কাজ বলে তারা যেমন সহজে অক্ষর ও সংখ্যা চিনতে পারবে, তেমনি সেগুলি দুদিনে ভুলে যাওয়ার আশংকাও থাকবে না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বর্তমানে শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে বলে বয়স্কদের শিক্ষা গ্রহণে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। একজন শ্রমজীবী মানুষ সারাদিন খাটা-খাটুনি করে। বিশ্রামের সময় তার ওপর লেখাপড়া চাপিয়ে দেয়া হলে, সে তাকে খুশীমনে নিতে পারে না কোনমতেই। পক্ষান্তরে, লোকশিল্পের মাধ্যমে জনশিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হলে একদিকে যেমন বয়স্ক শিক্ষার্থীদের রুজি-রোজগার বিঘ্নিত হবে না, অন্যদিকে তেমনি কাজ করতে করতেই তারা লাভ করতে পারবে অক্ষর ও সংখ্যা পরিচয়। শিক্ষা বিস্তারের এই লোকজ পদ্ধতিগুলি সদ্ব্যবহারের জন্য যথাযথ কর্মসূচী নেয়া হবে, তা প্রত্যাশিত।

নিরক্ষরতা মোচনে পরীক্ষার্থীদের ব্যবহার করার ব্যবস্থার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করার রয়েছে। এই ব্যবস্থায় বেশ কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর ক্ষতি হওয়া অথবা দুর্নীতি প্রশ্রয় পাওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমনই যে পরীক্ষার কয়েক মাস আগ থেকে রাতদিন মাথাগুঁজে পড়া ছাড়া পরীক্ষার্থীদের উপায় থাকে না। এই অবস্থায় একজন নিরক্ষরকে অক্ষর শেখানো একজন পরীক্ষার্থীর পক্ষে কতটা কঠিন কাজ তা সহজেই অনুমান করা যায়। এটা করতে গিয়ে অনেকের নিজের পড়ার ক্ষতি [illegible] হতে পারে। অনেকে হয়ত এক [illegible] অক্ষরজ্ঞানওয়ালাকেই নিরক্ষর হিসেবে কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাবে। তাকে না পড়িয়েই [illegible] পড়িয়েছে বলে ভাল নম্বর আদায়ের চেষ্টা করবে। এছাড়া শহরে [illegible]-বন্দরে নিরক্ষর যোগাড় করা নিয়েও সমস্যা দেখা দিতে পারে। শহরের সাক্ষর-নিরক্ষর সবাই [illegible]-খাওয়া মানুষ। কাজ বা রোজগার ফেলে পড়তে আসবে এমন নিরক্ষর খুব কমই পাওয়া যাবে। বছরের শুরুর দিকে অথবা পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীদের নিরক্ষরতা মোচনের দায়িত্ব দেয়া হলে উভয়কূল রক্ষা হবে, পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, নিরক্ষরতা মোচনের কাজও সম্পন্ন হবে নির্বিঘ্নে। পরীক্ষার্থীদের কল্যাণকে অগ্রাধি-[illegible] কেবল [illegible]